রাজনৈতিক দলের সংস্কারে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা

আহসান মোহাম্মদ

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশনের সকল কর্মকান্ডের ঘোষিত মূল লক্ষ্য হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও নির্বাচন সংস্কারের মাধ্যমে এমন একটি পরিবেশ তৈরী করা যেন শুধু আগামী নির্বাচনই নয়, বরং পরবর্তী নির্বাচনসমূহও প্রকৃত সৎ, যোগ্য ও দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব উপহার দিতে পারে। এ লক্ষ্যের প্রতি দেশের আপামর জনসাধারণ ও সেনাবাহিনীর অকুণ্ঠ সমর্থন রয়েছে। জরুরী অবস্থা ঘোষণার পূর্বে রাজনৈতিক অবক্ষয়ের কারণে দেশ একটি ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল। একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতৃত্বের আহ্বানে কয়েক লক্ষ রাজনৈতিক কর্মী লাঠি, বৈঠা, রড, ধারালো অস্ত্র, বোমা এমনকি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে রাজধানীতে জমা হয়। তারা প্রকাশ্য দিবালোকে রাজধানীতে টিভি ক্যামেরার সামনে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থকদেরকে পিটিয়ে হত্যা করে মৃতদেহের উপর উঠে উল্লাসে নৃত্য করে। দিনের পর দিন তারা রাজধানী সহ সারা দেশ অবরুদ্ধ করে রাখে। অপরদিকে নির্বাচনকে ঘিরে কোটি কোটি টাকার লেনদেনের বিষয়টি নিয়ে আর কোন রাখঢাক থাকে না। একটি দলের চেয়ারম্যান প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, তাঁর দলের প্রতি জনগণের সমর্থন রয়েছে, প্রয়োজন শুধু বিত্তশালী প্রার্থীর। তিনি ঘুষ নিয়ে দুটি প্রধান জোটে যাবার প্রতিশ্রুতি দেন এবং যে জোট বেশী ঘুষ দেয় তাতে শেষ পর্যন্ত যোগ দেন বলে পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়। পূর্ববর্তী নির্বাচনেও ব্যাপকভাবে অর্থের বিনিময়ে মনোনয়ন দেয়ার অভিযোগ উত্থাপিত হয়। এ সকল কারণে রাজনীতি চলে গিয়েছিল দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী ও জনগণের সাথে সম্পর্কহীন সুবিধাবাদীদের হাতে। ফলে দুই-তৃতীয়াংশের বেশী আসনে জয়ী দলটি দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে পারে নি। প্রধান চারটি রাজনৈতিক দলের তিনটিই পুরোপুরি ব্যক্তি ও পরিবার কেন্দ্রিক। যেহেতু দলের শীর্ষনেতারা তাদের যোগ্যতার দ্বারা নেতৃত্বে আসীন না হয়ে বরং পারিবারিক সম্পর্কের কারণে পদ পেয়েছেন, তাই তাঁরা চাইতেন না যে ভোটারেরা ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে রাজনৈতিক দলের প্রতি সমর্থন নির্ধারণ করতে পারুক। সে কারণে জাতিকে চরম সংঘাত ও বিভক্তির দিকে ঠেলে দেয়ার মাধ্যমে তারা দেশে সব সময় একটি যুদ্ধ যুদ্ধ পরিবেশ বজায় রাখতে চাইতেন। এ পরিস্থিতিতে জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর যখন রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কারের বিষয়টি আসে, তখন বিভিন্ন ধরণের ঝুকি সত্তেও জনগণ তাতে সমর্থন জানায়।

রাজনৈতিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে নির্বাচন কমিশন বেশ কিছু প্রস্তাবের খসড়া চূড়ান্ত করেছে। সে সকল প্রস্তাবের কয়েকটি বিভিন্ন মহলের সমর্থন পেলেও বাকী কয়েকটির কারণে রাজনীতি ও নির্বাচন কঠিন হয়ে যাবে বলে অনেকে আশংকা করছেন। কোন কাজ যখন কঠিন হয়ে পড়ে, তখন তাতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা কমে যায়, প্রতিযোগিতার পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং বিশেষ কিছু দল, ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তার থেকে বিশেষ সুবিধা নিতে পারে। পণ্যের বাজারে এভাবেই সিন্ডিকেটের জন্ম হয়। তবে সংস্কার প্রস্তাবসমূহের মূল দুর্বলতা হচ্ছে, তাতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিয়ে নানা শর্ত এবং নির্বাচনকালীন আচরণবিধি থাকলেও রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কারের সুস্পষ্ট কোন উদ্যোগ নেই। অথচ, রাজনৈতিক দলগুলো রাজনৈতিক নেতৃত্ব তৈরীর কারখানা হিসাবে কাজ করে। সে কারণে ভালো নেতৃত্ব পেতে হলে এই কারখানাগুলোকে এমনভাবে সংস্কার করতে হবে যেন সেগুলি থেকে উন্নত গুণগতমানের নেতৃত্ব তৈরী হয়। রাজনৈতিক দলগুলোকে যদি এমনভাবে সংস্কার করা যায় যে প্রকৃত যোগ্যতাসম্পন্ন, সৎ ও দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব দলের শীর্ষ নেতৃত্বসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃত্বে আসীন হন এবং তাঁরাই জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন, তাহলে অযোগ্য, অসৎ ও সন্ত্রাসীদের নির্বাচিত হয়ে সংসদে যাবার এবং দেশ পরিচালনার সুযোগই থাকবে না।

এক্ষেত্রে গুণগতমান নিশ্চিত করার আধুনিক ধারণা প্রয়োগ করতে হবে। ধরুণ ইউরোপের কোন একটি দেশে বাংলাদেশের একটি ঔষধ কোম্পানীর ঔষধ কেনা হবে। বাংলাদেশের ঔষধ কোম্পানীটি যে সঠিক মানের ঔষধ তৈরী করে এবং ভবিষ্যতেও করবে, তা তারা কিভাবে নিশ্চিত করবে? এক্ষেত্রে কয়েকটি নমুনা পরীক্ষা করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। বরং পণ্যটি তৈরীর প্রক্রিয়া প্রতিটি ধাপে মান নিশ্চিত করার কি কি ব্যবস্থা রয়েছে তা পরীক্ষা করা হয়। এক্ষেত্রে জোর দেয়া হয় পণ্য তৈরীর পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার উপর। একইভাবে নেতৃত্ব নামের রাজনৈতিক পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিত করতে হলে নেতৃত্ব তৈরীর পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে যেন মান নিশ্চিত করার ব্যবস্থা থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে।

আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর অধিকাংশই উন্নতমানের নেতৃত্ব তৈরী করতে পারছে না কারণ দলগুলোতে এ ধরণের নেতৃত্ব তৈরীর কোন ব্যবস্থা নেই। দলগুলোর প্রত্যেকের একটি করে গঠনতন্ত্র থাকলেও তা মানা হয় না। অপরদিকে যে গঠনতন্ত্র রয়েছে তাতেও নেতৃত্ব বিকাশের সুস্পষ্ট ব্যবস্থা নেই। যোগ্য নেতৃত্ব তৈরীর প্রধান উপায় হচ্ছে দলের অভ্যন্তরের নির্বাচন। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর গঠনতন্ত্রে নির্বাচন বিষয়ে অস্পষ্টতা রয়েছে যার ফলে দলগুলোকে সহজেই ব্যক্তি বিশেষের পৈত্রিক বা পারিবারিক ব্যবসাতে পরিণত করা গেছে। যেমন বাংলাদেশের প্রবীনতম দলগুলোর একটি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রে বলা হয়েছে যে দলের প্রেসিডেন্ট, সাধারণ সম্পাদক, বিভাগীয় সম্পাদকগণ ও কোষাধ্যক্ষ ত্রৈবার্ষিক কাউন্সিলের মাধ্যমে কাউন্সিলরদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন। বিভিন্ন জেলা থেকে কাউন্সিলরগণ নির্বাচিত হয়ে আসবেন। এখানে নির্বাচন পদ্ধতির বিষয়ে আর কোন কথা বলা হয় নি। এমনকি ভোট কি প্রত্যক্ষভাবে হবে না কি অন্য কোন পদ্ধতিতে হবে, কাউন্সিলরগণ তাদের ভোট গোপনে দিবেন, না কি কণ্ঠভোটে সিদ্ধান্ত হবে, প্রার্থীতা ঘোষণা করা হবে কিভাবে, নির্বাচন পরিচালনা করবে কে ইত্যাদি বিষয়ে কিছুই বলা হয় নি। অপরদিকে দল জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রে দলের আমীর নির্বাচনের ব্যবস্থা রয়েছে এভাবে - তিন বছরের জন্য জামায়াতের আমীর নির্বাচিত হবেন দলের সদস্যগণের প্রত্যক্ষ গোপন ভোটে। দলের মজলিশে সুরা তিনজনের একটি প্যানেল তৈরী করে দেবে। সদস্যগণ সেই তিনজনের মধ্য থেকে একজনকে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত করবেন। তবে এই তিনজনের বাইরের কোন সদস্যকেও ভোট দেয়া যেতে পারে। মজলিসে সুরা হচ্ছে দলের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী ফোরাম। মজলিসে শুরার সদস্যগণ নির্বাচিত হবেন সংশ্লিষ্ট জেলার সদস্যগণের প্রত্যক্ষ ভোটে।

রাজনৈতিক দলগুলোর বিরুদ্ধে অপর বড় অভিযোগটি হচ্ছে আর্থিক অনিয়ম সংক্রান্ত। বিগত নির্বাচনসমূহে দেখা গেছে দলের মনোনয়ন কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে বিক্রয় হয়েছে। এর ফলে একদিকে রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব চলে গিয়েছে জনগণের সাথে সম্পর্কহীন সুবিধাবাদী গোষ্ঠীর হাতে, অপরদিকে উক্ত ব্যক্তিগণ সংসদ সদস্য হওয়াটাকে নিয়েছেন একটি লাভজনক ব্যবসা হিসাবে। যে টাকা দিয়ে তারা মনোনয়ন কিনেছেন তার অনেকগুন টাকা তারা তুলে নিতে চেষ্টা করেছেন দুর্নীতি ও চাঁদাবাজির মাধ্যমে।

রাজনীতিকরা ব্যাপকভাবে দুর্নীতিগ্রস্থ হওয়ার পিছনে দলগুলোর অভ্যন্তরের আর্থিক ব্যবস্থাপনার অভাবও বহুলাংশে দায়ী। দলগুলোর গঠনতন্ত্র পর্যালোচনা করলে এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। যেমন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একজন সদস্যের তিন বছরের জন্য চাঁদা মাত্র পাঁচ টাকা। অবশ্য কাউন্সিলরদের জন্য এই হার একটু বেশী - তিন বছরে ২০ টাকা। সহজেই বোঝা যায় দল চালানোর টাকা কোথা থেকে আসে। দলটির সংবিধানে দলীয় তহবিলের অডিটেরও কোন বিধান নেই। অপরদিকে জামায়াতে ইসলামীর গঠণতন্ত্রে দলের অর্থের উৎস সম্পর্কে বলা হয়েছে যে দলের

সদস্য, কর্মী ও শুভাকাঙ্খীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত মাসিক চাঁদা, উশর ও জাকাত, অধঃস্তন সংগঠন থেকে প্রাপ্ত মাসিক নিসাব (কেন্দ্রের জন্য নির্ধারিত অংশ), জামায়াতের নিজস্ব প্রকাশনীর মুনাফা এবং জামায়াতের মালিকানাধীন সম্পত্তির আয়। দলটির অন্য একটি প্রকাশনায় সদস্যগণের মাসিক চাঁদার হার উল্লেখ করা হয়েছে তার মাসিক আয়ের নূন্যতম পাঁচ শতাংশ হিসাবে। কেন্দ্রীয় ও জিলা জামায়াতের তহবিলের হিসাব প্রতি বছর কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা কতৃক নিযুক্ত অডিটর দ্বারা পরীক্ষা করাতে হবে এবং অডিট রিপোর্ট কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরায় পেশ করতে হবে।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রেই সমস্যা রয়ে গেছে। যে দলের গঠনতন্ত্রে নেতা নির্বাচন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার বিষয়ে যত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং যত স্পষ্ট ও বিস্তারিত বিধান রাখা হয়েছে সে দল তত বেশী মানসম্পন্ন নেতৃত্ব তৈরী করতে পেরেছে। গঠনতন্ত্র সংস্কার না করে কোন ধরণের রাজনৈতিক সংস্কার টেকসই হবে না। এ জন্য নির্বাচন কমিশনকে দলগুলোর গঠনতন্ত্র সংস্কার করে সেগুলির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিতে হবে। এ উদ্দেশ্যে তিনটি কাজ করা যেতে পারেঃ

১. রাজনৈতিক দলগুলোর গঠনতন্ত্রসমূহ পর্যালোচনা করে সেগুলি সংস্কারের উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশনকে দলগুলোর গঠনতন্ত্রের ব্যাপারে একটি নির্দেশিকা দিতে হবে। তাতে বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা নির্বাচন এবং অর্থ সংগ্রহ, ব্যয়, হিসাবরক্ষণ, অডিট ইত্যাদি বিষয়গুলো থাকবে। উক্ত নির্দেশিকা অনুসরণ করে দলগুলো তাদের গঠনতন্ত্র সংশোধন করবে এবং নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে অনুমোদন করিয়ে নিবে। নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে এমন বিধানের নির্দেশিকা থাকতে হবে যার ফলে বিকল্প নেতৃত্ব সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ থাকে এবং দলে অন্তর্কলহ কম থাকে।

২. দলগুলো তাদের সংশোধিত গঠনতন্ত্র অনুসরণ করছে কিনা নির্বাচন কমিশন তা একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে পর্যবেক্ষণ করবে। উক্ত সময়ের মধ্যে দলগুলো তাদের বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচন সম্পন্ন করবে এবং নির্বাচন কমিশন তা নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করবে। তাছাড়া দলীয় তহবিলের হিসাব ঠিকমত রাখা হচ্ছে কিনা এবং তা নিয়ম মত অডিট করা হচ্ছে কিনা ইত্যাদিও দেখা হবে। যেহেতু নির্বাচনের এখনও দেড় বছরের বেশী বাকী রয়েছে, তাই নির্বাচন কমিশন এক বছরের মধ্যে এ কাজগুলো সম্পন্ন করে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করতে পারবে।

৩. বিদ্যমান আইন সংস্কার করে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা ও দায়িত্ব এমনভাবে বৃদ্ধি করতে হবে যেন দলীয় গঠনতন্ত্র অনুসরণের বিষয়টি নির্বাচন কমিশন নিয়মিত পরিবীক্ষণ করতে পারে এবং এর উপর ভিত্তি করে কোন রাজনৈতিক দলের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করার মত পদক্ষেপ নিতে পারে।

একটি সমরূপ, শান্তিপ্রিয়, পরিশ্রমী ও মেধাবী জনগোষ্ঠীর দেশ হিসাবে পৃথিবীর বুকে সমৃদ্ধ জাতির মর্যাদায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সকল সম্ভাবনাই বাংলাদেশের রয়েছে। এ জন্য সবথেকে বেশী প্রয়োজন সৎ, যোগ্য ও দেশপ্রেমিক নেতৃত্বের। বর্তমান সময়ে এই ধরণের নেতৃত্বকে সামনে আনার একটি সুযোগ তৈরী হয়েছে এবং এ কাজটির মূল দায়িত্ব গিয়ে পড়েছে নির্বাচন কমিশনের উপর। নির্বাচন কমিশনকে এখন করিৎকর্মতা ও কর্মদক্ষতার সাথে রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কারের উদ্যোগ নিতে হবে। দেশের আপামর জনগণ ও দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর দৃঢ় সমর্থন ও প্রত্যাশা রয়েছে এ ধরণের উদ্যোগের প্রতি।